দ্বন্দ্বের ব্যঞ্জনায় অজন্তার গুহাচিত্র

সুদেষ্ণা মজুমদার*

প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্প বিকাশলাভ করেছিল বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় চিত্রকলাও যে একইভাবে সমৃদ্ধ এবং চর্চিত হয়েছিল, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো অজন্তার গুহাচিত্রাবলী। মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাঁদ থেকে কিছু দূরে খান্দেশ পর্বতমালার শৈলশিরায় অবস্থিত অজন্তার এই গুহামন্দিরগুলি অন্তরে লুকিয়ে রেখেছে ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক বর্ণময় ইতিহাস।

কে বা কারা পাহাড়ের বুকে গুহামন্দিরের কাজ প্রথম শুরু করেন, আজ তা জানার উপায় নেই। তবে ঐতিহাসিক ও শিল্পতাত্ত্বিকদের সন্ধানে জানা গেছে যে অজন্তা-শিল্প দুটি পর্বে নির্মিত হয়। যে বৌদ্ধধর্ম খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রাজা বিম্বিসারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল, তা নতুনভাবে প্রাণ পায় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে, এবং তা হীনযান ও মহাযান এই দুইদলে ভাগ হয়ে যায় খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে, সম্রাট কনিষ্কের সময়। এই দীর্ঘ কালসীমায় স্থাপিত সাঁচী, ভারহুত বা অমরাবতীর বৌদ্ধস্তূপের মতোই অজন্তার গুহামন্দিরগুলিও আঞ্চলিক ধনশালী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে। বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল লোকালয় থেকে দূরে নিভৃতে যে পরমার্থের সাধনা করেছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন রূপের সাধনাকে যা তাঁদের সংঘারামকে এক কালোত্তীর্ণ শিল্পমাধুরী দান করেছে।

পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দেখা যায় যে বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক এই দুইয়ের আদানপ্রদানেই গড়ে উঠেছে শিল্প। ভারতশিল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। অজন্তার চিত্রাবলীতে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের এক পরিপূরক সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য বৌদ্ধস্তূপের মতই অজন্তার গুহাচিত্রও বিবৃত করে ভগবান বুদ্ধকে কেন্দ্রে রেখে জীবনের আবর্তন। গুহাগুলির অধিকাংশ চিত্রের বিষয় জন্মজন্মান্তরের বোধিসত্ত্ব, মানুষ বুদ্ধদেব, রাজপুত্র শাক্যসিংহ, স্বামী সিদ্ধার্থ, সংসারত্যাগে উদ্যত তথাগত, মহাকারুণিক অবলোকিতেশ্বর আর তাঁকে ঘিরে দেবতা, অপ্সরা, নারী, লোভী, ভিখারি, দস্যু, চোর, পশুপাখি, গাছ, লতা, পাতা, ফুল, অলঙ্কার, রাজার প্রাসাদ আর দরিদ্রের কুটীর। পশুপাখি, লতাপাতা বুদ্ধের জন্মান্তরের রূপ নিয়ে চিত্রগুলিতে স্বতন্ত্র চরিত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই চিরন্তন জীবনপ্রবাহ, ভাবের বৈচিত্র্য, উপকরণের বৈভব আর প্রাণের উৎসব বাঁচার আবেগকেই একযোগে প্রকাশ

---

* অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ রামপুরহাট কলেজ, বীরভূম

করে, বুদ্ধ যাকে বলেছেন 'তন্হা', যার নিবৃত্তিই বৌদ্ধধর্মের প্রধান মার্গ। এ প্রসঙ্গে মুল্ক রাজ আনন্দের উক্তিটি অজন্তার বিষয়গত আর আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যকে একই তারে বেঁধেছে—

এইসব ছবির ভিড়ে প্রথম দর্শনেই যা ধারণা জন্মায়, তা হল স্বতঃস্ফূর্ত আকারপ্রকারের আপাত এলোমেলো বিন্যাসে নানা বর্ণের স্বচ্ছ সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ। কিন্তু কেউ যদি কোন একটি দেয়ালকে আলাদাভাবে ভালো করে লক্ষ্য করে, তাহলে এ বিশ্বের অগুনতি পাহাড়ের মধ্যে থেকে সে প্রতিটি চিত্রের ক্ষুদ্র প্রতীকী জগতে প্রবেশ করবে। প্রতিটি ভাবনা অন্ধকারের গভীর থেকে প্রকাশ করে বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট কিছু ছবিকে, যা সবচেয়ে সূক্ষ্ম অনুভূতি, চিন্তা আর আবেগের সন্ধান দেয়, যা যেকোন সংবেদনশীল মানুষের চেতনায় নিঃশব্দে প্রবেশ করে এবং মানবজীবনের জন্ম, মৃত্যু ও মিলনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার যে গভীর বেদনা, তারই নির্দেশ দেয়। (আনন্দ ১৪)

অজন্তার গুহাশিল্পে জীবনের উদ্দেশ্য আর প্রকাশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এক দ্বন্দ্ব চোখে পড়ে। চিত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার সৃষ্টির আবহাওয়া বা পরিপ্রেক্ষিতের এই আপাত বিপরীত অবস্থানের অন্যতম কারণ হল স্রষ্টার অন্তর, যেখানে শিল্পী ও সাধকের সত্তার মধ্যে চলেছে দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টায় নিরন্তর ভাববিনিময়। বিষয়গত এবং আঙ্গিকগত দ্বন্দ্বের সমন্বয়ে অজন্তাচিত্রের সৌন্দর্য যে ভাবে বিকশিত হয়েছে, অশোক মিত্র তাঁর ভারতচিত্রকলার আলোচনায় তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

যে সব শিল্পী এখানে সব কিছু ত্যাগ করে নিরলস একাগ্রমনে বছরের পর বছর কাজ করে গেছেন, জীবনের রূপ, রস, গন্ধের প্রতি তাঁদের ছিল নিদারুণ আসক্তি। ফুল, লতা, পাতা, পাখি, প্রাণী, মানুষ, সামাজিক আচার ব্যবহার নিয়ত তাঁদের উত্তেজিত, চঞ্চল, আবিষ্ট করেছে, যার ফলে বাগোড়ার পাথর কাটা নদীর বুকে, জঙ্গলের গুহায়, তাঁরা কখনই নিজেদের মনকে বাঁধা পড়তে দেননি। বরং প্রতিটি ধর্মবিষয়ক চিত্রেও একান্ত মানুষী ভাব, প্রকৃতির বৈভব, বৈচিত্র্য, প্রাণস্পন্দন, উত্তেজনা যেন উপছে উপছে পড়ছে। ছবিতে জীবনের যেন শেষ নেই। অবশ্য এত আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস সবই সংহত করে আছে একটি অতি সরল ঋজু, নিরাভরণ চিত্রনীতি, যার মূল উপাদান হল আবেগময়, ক্লেশহীন, প্রাণবন্ত, শুধুহাতে-খেলানো সীমারেখা। প্রত্যেকটি চিত্রের কম্পোজিশন, অর্থাৎ ছবিতে আঁকা বিষয়বস্তুর পারস্পরিক ভারসাম্য, সম্বন্ধ, গভীরতা অতি সুন্দর, প্রতিটি বিষয় নিপুণ হাতে আঁকা, নকশার দক্ষতা বিপুল। (মিত্র ৫০)

মানবমনে নিহিত যে সৃজনশীল শক্তি, তার প্রকাশ ঘটেছে যুগে যুগে, সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, নাটকে। ইতিহাসের শিল্প নিদর্শনগুলি মানুষের এই আত্মপ্রকাশের ক্ষমতার পরিচায়ক। অজন্তার গুহায় বসবাসকারী বৌদ্ধ শ্রমণদের সাধনায়, কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোরতার মধ্যে থেকে উৎসারিত হয়েছিল আত্মপ্রকাশের আবেগ। তাঁদের সেই নিহিত শিল্পীসত্তাই অপূর্ব ভাবময় চিত্রগুলির জন্ম দিয়েছে। পার্থিব

জীবনের সুখভোগ তাঁরা না করলেও সংসারের সেই সুখদুঃখ, হতাশা, উৎসাহ আর আনন্দের অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়েই তাঁরা চলেছেন সাধনমার্গে। অজন্তার গুহাচিত্র সেই অভিজ্ঞতার নিদর্শন বলে মনে করা যেতে পারে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর অজন্তা দর্শনের অভিজ্ঞতায় গুহা খননের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ শ্রমণদের নিঃস্বার্থ এবং নিরলস সাধনার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন,

সত্যি কথা বলতে, তাঁদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা, তাঁদের সবকিছু উজাড় করে দেওয়া এবং পরিবর্তে কিছুই না চাওয়া, এই গুণই একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে অল্প সময়ের মধ্যে স্থায়ী প্রকৃতির এত কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম করে। ... এবং এর পিছনে রহস্যটি হল, সন্ন্যাসীর কাজই তাঁর সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য। তাঁর কাজ যাই হোক না কেন— নির্মাণ, শিক্ষা, অথবা উৎপাদন— তাঁর আদর্শ অনুযায়ী, সেই কাজের বাইরে তাঁর আর কোনও অভিপ্রায় থাকতে পারে না। (নিবেদিতা ১০)

তিনি আরও বলেন যে, প্রাচীন ইউরোপীয় মঠ ও গির্জাগুলিও একইভাবে চাষী আর গ্রাম্য শ্রমিকদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিলো। নিবেদিতার এই তুলনা ও মূল্যায়ন থেকে বোঝা যায় যে অজন্তার শ্রমণদের মধ্যে সাধকসত্তাটি অনিবার্যভাবেই শিল্পীসত্তায় মিলেছিলো, যা তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে যুগব্যাপী সমবেত শিল্পসাধনায়।

শুধুমাত্র গুহামন্দির আর সঙ্ঘারামের প্রাচীরগুলির সৌন্দর্যসাধনই নয়, চিত্রের মাধ্যমে বুদ্ধের জীবন, সাধনা ও উপদেশগুলি তুলে ধরার অপর উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের জীবন থেকে শিক্ষালাভ করা। তথাগত বুদ্ধ মানুষের শরীর গ্রহণ করেই জন্ম নিয়েছিলেন, মানুষের দুঃখে হয়েছিলেন বেদনার্ত। তাই অজন্তার অনামা শিল্পীদের তুলিতে মানুষের শরীর সার্থক হয়ে উঠেছে। এ থেকে ভেবে নেওয়া যেতে পারে যে, অজন্তাচিত্রের বিষয়বস্তু আর তার পরিপ্রেক্ষিত বা উপস্থাপনার উদ্দেশ্যের মধ্যে আপাত একটি ফারাক থাকলেও তার সামগ্রিক লক্ষ্যটি ছিল নৈতিক, যেখানে জীবনচিত্রের বর্ণিল প্রদর্শনীর আড়ালে নিহিত রয়েছে অকথিত চিত্তনিবৃত্তির সুর। তুলনাস্বরূপ বলা যায় যে, খ্রিষ্টীয় একাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ডে স্যাক্সন চার্চের দেয়ালে যে ফ্রেস্কোগুলি আঁকা হয়, সেখানেও একইভাবে ধর্মীয় আবহে রচিত হয়েছিল দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবহুল খণ্ডচিত্র যার উদ্দেশ্য ছিল একইসঙ্গে দর্শকের মনোরঞ্জন এবং নৈতিক শিক্ষাদান। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতা যখন অজন্তা দর্শন করেন, তখন তাঁর মনেও অজন্তার সংঘারাম ও স্তূপমন্দিরগুলির সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপের ধর্মীয় মঠগুলির তুলনা এসেছিলো, যা তিনি তাঁর "The Ancient Abbey of Ajanta" (1910) প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি ইতালির ফ্লোরেন্সের বাইরে একটি প্রাচীন ডমিনিকান মঠ 'সান মারকো'র প্রসঙ্গ তুলে বলেন যে, সেই মঠের দেয়ালে রেনেসাঁ যুগের শিল্পী ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকো (১৩৯৫-১৪৫৫) যে আধ্যাত্মিক চিত্রাবলী এঁকেছিলেন, সেই কারণেই, "এখনও পর্যন্ত সন্ন্যাসিনীদের সেই পুরনো সংঘটি ইউরোপের কাছে ন্যায়নিষ্ঠতা এবং সৌন্দর্যের মিলনক্ষেত্র হয়ে আছে" (নিবেদিতা ৭০)। তিনি এও মনে করেন যে,

"এই একই ধরনের কোনও অনুভূতি নিশ্চয়ই পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিক থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত অজন্তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল" (নিবেদিতা ৭০)। সৌন্দর্যসাধন ও নৈতিক শিক্ষার যুগ্ম উদ্দেশ্য উভয় শিল্প সৃষ্টিতে থাকার কারণেই নিবেদিতা অজন্তাকে 'ভারতীয় সান মারকো' বলে অভিহিত করেছেন।

ভারতবর্ষের সাঁচী, ভারহুত ও অমরাবতীর স্তূপভাস্কর্য ছাড়াও পারস্য, মিশর, চীন, গ্রীক ও মেসোপটেমিয়ার অলংকারের নকশার প্রভাব অজন্তার বিভিন্ন ছবিতে পড়েছে যা উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বম্বে স্কুল অফ্ আর্টের অধ্যক্ষ ডঃ গ্রিফিথস্ তাঁর বিদগ্ধ আলোচনা The Paintings in the Buddhist Cave-Temples of Ajanta (1896-97)-তে ছবি থেকে উদাহরণ তুলে তুলে দেখিয়েছেন। এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, অজন্তাচিত্রের বিষয়গত বৈচিত্র্য প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্যান্য বৈদেশিক সভ্যতার সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ফলস্বরূপ এসেছে। ভগিনী নিবেদিতার বক্তব্যতেও এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হচ্ছে, "এই অপূর্ব সৌধটির জটিলতায়, চিন, গান্ধার, পারস্য এবং সিংহলের উপাদানের সঙ্গে মিশে আছে ভারতের সব অংশের স্পর্শ" (নিবেদিতা ২৬)। একইভাবে, নারায়ণ সান্যালও অনামা শিল্পীদের সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রতিই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন— "বিশ্ব-সৃষ্টির অসীম বৈচিত্র্যকে তিনি রঙ ও রেখায় ধরতে চেয়েছেন, ছোট ছোট চৌখুপিতে; কিন্তু প্রতিটি বিষয়-বস্তুর প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা, দরদ আর সংবেদনা বর্তমান।... গাছ-ফল-পাখী-পশু বাস্তবানুগ হল কিনা এ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই— কিন্তু সেগুলি যে এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ-প্রপঞ্চে ভীষণ ও সুন্দরের বিচিত্র প্রকাশ, এ কথা শিল্পী কখনও ভোলেন নি" (সান্যাল ১৯৮)। এ কথা সত্যি যে, অজন্তার দেয়ালচিত্রে গাছপালা, লতাগুল্ম, ফুল, পাখী, পশু ও মানুষের যে বিচিত্র সমাহার তা বিষয়গত বৈচিত্রের পরিচায়ক। তবে একই সঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে, চিত্রাবলীর দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এই জড় ও জীবজগত একমুখীন বা কেন্দ্রাভিগভাবেই অবস্থান করছে। তাদের সমস্ত কর্ম ও যাপনের কেন্দ্রে আছেন বোধিসত্ত্ব, তাই একযোগে তারা বুদ্ধের ত্যাগ, করুণা ও মানবিকতার কাহিনী বিবৃত করে, যা তাদের নৈতিক মূল্যবোধের অভিন্ন সূত্রে বেঁধেছে। সেক্ষেত্রে তারা একটি pattern বা ছক এর অন্তর্গত, যে ছক বারেবারে নানা পরিস্থিতিতে বোধিসত্ত্বের বৈরাগ্যের মহান রূপটিকেই উপস্থাপনা করতে চেয়েছে। সুতরাং বিষয়গতভাবে ছবিগুলিতে সর্বত্র জীবনের সরস উদযাপনের সঙ্গে নৈতিক সংযমের দ্বন্দ্বময় সহাবস্থান দেখা যায়।

চিত্ররীতির নিরিখে দেখলে অজন্তার ছবিগুলি দুটি পর্বে আঁকা হয়েছিলো বলে মনে হয়। প্রথম পর্বের ৯, ১০, ১২, ১৩ ও ১৫ নং গুহাগুলি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতক থেকে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে আঁকা হয়। এইসময় দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল সাতবাহন সাম্রাজ্য। প্রথমযুগের নির্মিত আলেখ্যে চরিত্রের পরিচ্ছদ, উষ্ণীষ ও নিরাভরণ উপস্থাপনা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ সাঁচী ও ভারহুতের ভাস্কর্যচিত্রের মতো। এরপরের কিছুকাল এখানে শিল্পকর্মের

চর্চায় তেমনভাবে বিবর্তন বোঝা যায় নি। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে (গুপ্তযুগে) অজন্তাশিল্পের পুনরুত্থান ঘটে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে এ সময় বাকাটক রাজারা শাসন করছিলেন। এই বংশের রাজা ও রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত এইসময়ের ৪, ৬, ১১, ১৫, ১৬ এবং ১৭ সংখ্যক সঙ্ঘারামগুলিতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের আবহে চিত্রের আধিক্য ও উৎকর্ষ চোখে পড়ে। ১ ও ২ সংখ্যক গুহার ছবিগুলি আঁকা হয় খ্রিষ্টীয় সপ্তম সতকের প্রথমার্ধে। অজন্তাশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গণ্য ১, ২, ১৬ ও ১৭ সংখ্যক গুহার এই চিত্রগুলিতে মানবদেহের চিত্রণে একটি দীর্ঘ ছন্দময়তা দেখা যায়, যেটি অজন্তাচিত্রের ওপর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে নির্মিত দক্ষিণ ভারতের অমরাবতী স্তূপভাস্কর্যের পরোক্ষ প্রভাব বলে মনে হয়। 'কৃষ্ণা অপ্সরা', 'মেঘলোকে ইন্দ্র', 'মরণাহতা রাজকন্যা' বা 'রাজসভায় নর্তকীর' চিত্রগুলিতে এই সুকুমার ভাবটি বিভিন্ন আবেগকে স্পষ্ট করে তুলেছে, যে আবেগের বাহুল্য বৌদ্ধধর্মের নিবৃত্তি মার্গের পথে বাধাস্বরূপ আসে যা অতিক্রম করে বোধিসত্ব উপাসক দর্শকের সামনে একটি নৈতিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

আঙ্গিকগতভাবে অজন্তার সরল এবং ঋজু স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের লীলায়িত ছন্দ যেমন সঙ্গত করে চলে, তেমনই গুহার গায়ে এবং স্তম্ভের সারিকে লতার মত জড়িয়ে থাকা চিত্রগুলির মধ্যেও রয়েছে ঋজু আর বক্ররেখার নিত্য আলাপচারিতা, যা অজন্তাচিত্রের আঙ্গিকগত দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে। পাথরের দৃঢ় থামগুলি গুহামন্দিরগুলিকে এক অনড় ও কালজয়ী রূপ দান করেছে, এবং এরই পাশাপাশি রয়েছে লীলায়িত ভঙ্গিমায় মানবদেহ এবং আলঙ্কারিক লতাপাতা ও মেঘমালার সহাবস্থান। ছবিগুলির মধ্যেও সরল ও বক্ররেখার সহাবস্থান পরস্পরের পরিপূরক হয়ে চিত্রের ছন্দ বজায় রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ, ষোড়শ গুহার 'মরণাহতা রাজকন্যা' (চিত্র ১) ছবিটির কথা বলা যেতে পারে, যেখানে সাদা ও ধূসর রঙের ঋজু ও কঠিন স্তম্ভগুলির বিপরীতে তরঙ্গায়িত হয়ে আছে মূর্ছিতা জনপদকল্যাণীর দেহলতা এবং তাঁকে ঘিরে উৎকণ্ঠিত সখীদের দেহের বিভঙ্গ। স্তম্ভগুলির সরল গঠন আর ধূসর-সাদা বর্ণ মরণোন্মুখ কৃষ্ণবর্ণ দেহটিকে আরও নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করে। অজন্তার সপ্তদশ গুহার দুটি ছবি 'কৃষ্ণা অপ্সরা' ও 'মেঘলোকে ইন্দ্র'— আঙ্গিকগতভাবে এবং ভাবগতভাবে সমধর্মী। উড়ন্ত 'কৃষ্ণা অপ্সরা' (চিত্র ২) অজন্তার দ্বিতীয় পর্বের চিত্রধারার উৎকর্ষের অন্যতম প্রধান উদাহরণ। ওড়ার বেগে হাওয়ায় উতলা তার উত্তরীয় আর বায়ুভ'রে স্থানচ্যুত অলঙ্কারের মুক্তোর ঝালর, তার অর্ধনিমীলিত চোখের অলস দৃষ্টিপাত, তার কমনীয় দীর্ঘ আঙ্গুলে জড়ানো মন্দিরার সূত্র সমগ্র ছবিটিতে একটি সংগীতময় কল্পলোকের আবহ সৃষ্টি করে যা কালিদাসের 'মেঘদূত'এর অনুষঙ্গ আনে দর্শকের মনে। এই সুকুমার সূক্ষ্মতা চিহ্নিত করে দৈহিক রূপমাধুর্যের শিল্পীদের মনোযোগ, যা অজন্তায় গুপ্তযুগের শিল্পধারায় দেখা গিয়েছিলো। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে কালিদাসও ছিলেন গুপ্তযুগের কবি।

অনুরূপ একটি স্বপ্নময় চিত্র সপ্তদশ গুহাতেই অবস্থিত 'মেঘলোকে ইন্দ্র' (চিত্র ৩), যেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের আগে আগে বীনা হাতে ইন্দ্র তাঁর গন্ধর্ব অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যে নেমে আসছেন বুদ্ধের অর্চনায়। এই চিত্রে সাদা রঙের মেঘপুঞ্জে নীলাভ ছায়া, এবং দেহগুলির দীর্ঘ ছন্দময় সজ্জা চরিত্রগুলিকে দেবলোকের লঘুভার বিমূর্ত ব্যঞ্জনা দিয়েছে যা অমরাবতীর স্তূপভাস্কর্যের ছায়া মনে আনে। ছবিতে গন্ধর্বদের বাঁশী ও বীনার হেলানো রেখায়, উড়ন্ত দেবতাদের দেহতরঙ্গে এবং মেঘের অসম পুঞ্জিত অবস্থানে শিল্পীর কল্পনার মুক্তিই প্রকাশ পায়।

এই সপ্তদশ গুহাতেই আঁকা রয়েছে 'বুদ্ধসমীপে রাহুল ও রাহুলমাতা' (চিত্র ৪) ছবিটি, যা বিষয় এবং আঙ্গিকের দিক থেকে ভিন্ন হওয়ায় সামগ্রিকভাবে ভাবগত বা mood-এর পার্থক্যকেই তুলে ধরে। এই ছবিতে ভগবান বুদ্ধকে ভিক্ষাপাত্র হাতে দেখা যাচ্ছে। তাঁর সামনে একটি শিশু ও জননী, যাদের রাহুল ও রাহুলমাতা যশোধরারূপে ভাবা হয়। এই ছবিতে বাদামী, হলদে, গৈরিক ও কালোর ব্যবহার এনেছে একটি সংযত, করুণ গাম্ভীর্য। বুদ্ধের বিশাল আকৃতি তাঁকে মহামানব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, ছবির ডানদিকে নীচের কোণে মা আর ছেলের ক্ষুদ্র আকৃতি সেই বিশালত্বকে আরই প্রকট করে। 'বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি' চিত্রের মতোই এই চিত্রটিতেও প্রেক্ষাপটের প্রয়োগ বাস্তবানুগ নয়, তা ভাবনির্ভর। বুদ্ধের আকৃতিই তাঁকে কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করে। যশোধরার দুটি হাতে দুই ধরনের মুদ্রা তাঁর মনের দোলাচল ভাবেরই সূচক; তাঁর বামহাতের মুদ্রায় তিনি রাহুলকে এগিয়ে দিচ্ছেন সন্ন্যাসীর দিকে, কিন্তু তাঁর ডান হাতটি শিশুপুত্রের কাঁধ স্পর্শ করে আছে তাকে আগলে রাখার প্রয়াসে। এই ছবির চিত্রপরিকল্পনায় সরলরেখার প্রাধান্য বেশি এবং রেখাগুলির বিন্যাস বুদ্ধদেবের দৃঢ়তা, ত্যাগ আর সংযমের পরিচায়ক। চিত্রের বামদিকে বুদ্ধের বিশালতার সঙ্গে সাম্য বজায় রেখে ডানদিকে উঁচু সৌধ আঁকা হয়েছে যা পার্থিব জীবনের প্রতীক। বুদ্ধের পিছনে কালো আকাশ মহাবিশ্বের শূন্যতার সূচক, তাঁর মাথার পিছনে গৈরিক শোভা এবং ছাতা ধরে থাকা উড়ন্ত দেবদূত সমগ্র চিত্রে এনেছে এক দিব্যভাব ও বিশালত্বের রোমাঞ্চময় অনুভূতি, যাকে সাহিত্যের ভাষায় বলা যেতে পারে sublime monumentality। অলংকারবর্জিত এই ছবিটি আঙ্গিকের দিক থেকে 'কৃষ্ণা অপ্সরা' বা 'মেঘলোকে ইন্দ্র'র বিপরীতধর্মী। এখানে রেখার ঋজুতা এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে বুদ্ধের পরিধানে গৈরিক রঙের flat block বা একই বর্ণ লেপে দেওয়ার কারণে ছবিতে যে ঘনত্ব বা massive ভাব এসেছে তা অপ্সরা বা ইন্দ্রের ছবির লঘুভার পেলব স্বপ্নময়তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ছবি তিনটির তুলনামূলক আলোচনা এক উদাহরণমাত্র, কারণ অজন্তার গুহাগুলিতে এমন বিপরীতধর্মী ছবির আরও অনেকক্ষেত্রেই সহাবস্থান আছে, যেখানে বুদ্ধের উপদেশ দানের পটভূমিকায় উপস্থিত উপাসকবৃন্দ (দশম গুহায় বোধিবৃক্ষের পূজায় সপারিষদ নাগরাজা) এবং ভিক্ষু-শ্রমণরা নিরাভরণ গৈরিকবস্ত্রে, স্তব ও প্রণামের সংযত ভঙ্গিমায় সাত্ত্বিক শান্তরসের আবহ সৃষ্টি করেছেন (সপ্তদশ গুহায় 'বুদ্ধের

উপদেশদান') (চিত্র ৫), যা রাজসভার লাস্যময়ী নর্তকী (প্রথম গুহা, 'মহাজনক জাতক') বা মোহিনীনারীর শৃঙ্গাররসকে (সপ্তদশ গুহা, 'সিংহলাবদানজাতক') নিয়ত প্রশমিত করছে। এই সপ্তদশ গুহাতেই সারিবদ্ধ মৈত্রেয়বুদ্ধের ধ্যানস্থ মূর্তির নীচের সারিতে পরস্পর আশ্লিষ্ট গন্ধর্বমিথুনের দল জগৎ সংসারের ভোগ এবং ত্যাগের দুই সমান্তরাল ধারার সূচকরূপে দর্শকের সামনে প্রতিভাত হয় (চিত্র ৬)।

অলংকরণের ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পর্বের গুহাগুলিই সমৃদ্ধ। অজন্তাচিত্রের এই লীলায়িত আলংকারিক দিকটি গান্ধারশিল্পের প্রচ্ছন্ন প্রভাবকে ইঙ্গিত করে। প্রধানত অলংকরণের মাধ্যমেই অজন্তাচিত্রের আঙ্গিকে ছন্দ ও শৃঙ্খলার দ্বন্দ্বটি সবচেয়ে সহজভাবে বোঝা যায়। গুহার ছাদের নীচের দিকের সিলিং-এ গাছ, লতাপাতা, গুল্ম, ফুল, ফল, পশু, পাখী, মানুষ এবং কিন্নরকে নিয়ে বর্ণময়, বিচিত্র নকশা দেখা যায় যা অত্যন্ত সুললিত ও স্বাভাবিকভাবে চিত্রের অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে। অজন্তার প্রথম গুহায় পদ্মবনে খেলা-করা যে শ্বেতহস্তীর ছবিটি রয়েছে (চিত্র ৭), তার দেহের ডৌল দেহপেশীতে আর পদ্ম ধরে-থাকা শুঁড়ের কুঞ্চনে গোলাপি আভা এবং বক্ররেখার প্রয়োগে বোঝানো হয়েছে। সেই রেখার ছন্দ চারপাশের পদ্মফুলের পাপড়ি ও মৃণালের ছন্দের সঙ্গে মিলে একটি অলংকরণের রূপ দিয়েছে। ভগবান বুদ্ধের জন্মের প্রতীক এই শ্বেতহস্তী অজন্তার বিভিন্ন চিত্রেই উপস্থিত। ভগবান বুদ্ধের পূর্বজন্মের প্রতীকস্বরূপ দুটি স্বর্ণ রাজহাঁসের ছবিও এই প্রথম গুহাতেই আঁকা রয়েছে। হাঁসদুটির দেহের চারপাশে ফুল ও লতার নকশাগুলি তাদের চলনকেই যেন সামগ্রিকভাবে প্রকাশ করে। প্রথম গুহার ছাদের একটি চিত্রে তরঙ্গায়িত রেখার প্রয়োগ আগুনের রূপ নিয়েছে যার অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে মহিষের কিছু আকৃতি। এই ধরনের আলংকারিক উপস্থাপনা ফুল ও পশুপাখিকে বাস্তব অবাস্তবের সম্মিলিত রূপ দেয় (চিত্র ৮)। অজন্তায় পত্র ও পুষ্পের যে লীলায়িত ডৌল বা curve, যেটি ধ্রুপদী ভারতীয় অলংকরণের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যকে যুগ যুগ ধরে নির্ধারণ তথা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, তাকে প্রধানত কৌণিক ও বৃত্তাকার রেখা অথবা সরলরেখার সীমায় ছন্দবদ্ধভাবে সাজানো হয়েছে, এবং তখনই এগুলি চিত্র থেকে নকশায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এইভাবে অজন্তার অলংকরণে ডৌল ও সরলরেখার সহাবস্থান কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত চলন ও তার ভারসাম্যের দিকে ইঙ্গিত করে। এক্ষেত্রে আঙ্গিকের নিপুণ প্রয়োগ জীবনের বৈচিত্র্য ও সংযমের মধ্যে ঘটে চলা নিরন্তর দ্বন্দ্বকেই বোঝায়।

এছাড়াও অজন্তার ছবিতে নকশার পাশাপাশি বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থিতি একেকটি খণ্ড মুহূর্তের অবতারণা করেছে, যা অনেকক্ষেত্রেই হাস্যরসের বাহক। মূল চিত্রগুলির আশপাশে, ছাদের অলংকরণের কোণে কোণে, অথবা স্তম্ভের মাথার দিকে কিছু বামনাকৃতি বাদ্যকর বা বিদূষকদের দেখা যায়, যাদের উপস্থিতি ভাস্কর্যেও রয়েছে। প্রথম গুহার ছাদের একটি খণ্ডচিত্রে দেখা যায় এইরকম দুটি বামনকে যাদের মাথায় টুপি আর মুখেচোখে ভাবের অতিরঞ্জিত অভিব্যক্তি তাদের comical চেহারা দিয়েছে (চিত্র ৯)। এরা একে অন্যের গলায় দড়ি পরিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথম গুহাতেই

সপারিষদ পারসিক রাজার ছবিটিও লঘুরসের অনুষঙ্গ আনে। এই নরনারীদের গায়ে কোট, পায়ে মোজা, মাথায় পাগড়ি। এরা পরস্পরের সঙ্গে গল্পে, খেলায়, নাচগানে মেতে আছে। অজন্তার গুহায় গুহায় যে বৃহৎ জীবননাট্যের উদাহরণ রয়েছে, এই বিচ্ছিন্ন ছোট ছবিগুলি সেখানে পার্শ্বচরিত্ররূপে আসে। মূলচিত্রের সঙ্গে এদের সবসময় যোগাযোগ দেখা যায় না, বরং কাহিনীচিত্রের ঘটনাপ্রবাহের মাঝে মাঝে বিরাম নেওয়ার অবসর হিসেবে এগুলিকে দেখা যেতে পারে। তৎকালীন জীবনের সাধারণ ও দৈনন্দিন চেহারাটি এই খর্বকায় চরিত্রগুলি তুলে ধরে। ভগবান বুদ্ধকে ঘিরে যে সমাহিত, বিষণ্ণ ও ভাবগম্ভীর কাহিনীর আবহ তারই বিপরীতে অদ্ভুতরসের সৃষ্টি করে মনকে এক ধরনের comic relief দিচ্ছে এই ছবিগুলি। অজন্তাচিত্রে দ্বন্দ্বময় ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে তাই এদের ভূমিকাও কম নয়।

আঙ্গিকগতভাবে, অজন্তার চিত্রগুলিতে চলেছে যে কোনও আতিশয্যের দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করে নিরন্তর সামঞ্জস্যরক্ষার প্রয়াস। অজন্তার ছবিকে বোঝার ক্ষেত্রে নন্দনতাত্ত্বিকরা ধ্রুপদী ভারতশিল্পতত্ত্বে নিহিত ষড়ঙ্গের ধারণাটি প্রয়োগ করেছেন। ষড়ঙ্গের সূত্রটি হল,

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।। (অবনীন্দ্রনাথ ১)

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গের আলোচনায় সূত্র হিসেবে বাৎস্যায়নের কামসূত্রের উল্লেখ করে বলেন, "বাৎস্যায়ন-কামসূত্রের প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়ের টীকায় যশোধর পণ্ডিত আলেখ্যের এই ছয় অঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন" (অবনীন্দ্রনাথ ১)। একটি চিত্রে রসসৃষ্টির জন্যে যে ছয়টি গুণ থাকা প্রয়োজন, তা হল, রূপভেদাঃ (একটি বস্তুর রূপের সঙ্গে অপর বস্তুর গঠনের প্রভেদ), প্রমাণানি (চিত্রে মানবদেহ বা পশুপাখির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনের পারস্পরিক অনুপাত), ভাব (চিত্রে আঁকা মানবদেহে, ফুলে ফলে, পাতায়, পশুপাখির অবয়বে ও অবস্থানের ভঙ্গীতে যার প্রকাশ চিত্রের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলে), লাবণ্যযোজনম্ (চিত্রে অঙ্কিত বস্তুতে লাবণ্যের আরোপ করা), সাদৃশ্যং (প্রকৃতিতে দৃশ্যমান লতাপাতা, পশুপাখির বিভিন্ন গড়নের সঙ্গে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির তুলনা), বর্ণিকাভঙ্গ (চিত্রে রঙ দেবার জন্যে রঙ প্রস্তুত করা এবং তা ছবিতে ব্যবহার করা)। প্রাচীন ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গের ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল ছবিতে যে কোন বস্তুর আদর্শরূপটি প্রকাশ করা, অবনীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন চিত্রের 'ছন্দ'— "ঊষার ভিতরে যেমন উদয়ের অভিপ্রায় নিহিত রহে তেমনি ছন্দের ভিতর দিয়া চিত্রকরের মনোভিপ্রায় আপনাকে ব্যক্ত করে; সেই জন্য ছন্দকেই বলা হয় 'অভিপ্রায়'।... ছন্দ বহুবিধ; রূপের প্রমাণের ভাবের লাবণ্যের সাদৃশ্যের বর্ণিকাভঙ্গের ছন্দ" (অবনীন্দ্রনাথ ১৫)। অজন্তাচিত্রে ছন্দের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে এই ছ'টি বৈশিষ্টের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তার প্রশমনে। ষড়ঙ্গের মধ্যে রূপভেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ বা মাপকাঠির সহাবস্থান অজন্তাচিত্রের আঙ্গিকগত দ্বন্দ্বকে বোঝাতে সাহায্য করে। রূপভেদ, যা

বৈচিত্রের পরিচায়ক, তাকেই প্রমাণের সীমাবদ্ধতায় এনে একটি সাম্যাবস্থার কথা ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে বলা হয়েছে। অপরদিকে শুধুমাত্র প্রমাণের মাপজোকই নয়, চিত্রে লাবণ্যযোজনেরও প্রয়োজন আছে, যা স্বতঃস্ফূর্ততাকে প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন,

রূপকে যেমন পরিমিতি দেয় প্রমাণ, যথোপযুক্ত এবং যথাযথ মনোহর একটি সীমার মধ্যে আনিয়া, তেমনি লাবণ্য পরিমিতি দেয় ভাবের কার্যকে বা ভঙ্গীকে অদ্ভুত ও উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গী হইতে নিরস্ত করিয়া।... প্রমাণের বন্ধনে যে কঠোরতাটুকু আছে, লাবণ্যের বন্ধনে সেটুকু নাই; অথচ সেও বন্ধন, সুনিশ্চিত একটি সুন্দর সুকুমার বন্ধন। ... অতিরিক্ত লাবণ্যে চিত্রের ভাবভঙ্গী তিক্ত হইয়া পড়ে, অত্যল্প লাবণ্যে তাহা আস্বাদহীন হয়। (অবনীন্দ্রনাথ ৩৯)

পাশ্চাত্য চিত্রকলায় অষ্টাদশ শতকে শিল্পী উইলিয়াম হগার্থও একইভাবে Fitness এবং Variety-র পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থানকেই সৌন্দর্যসৃষ্টির মূলসূত্র বলে অভিহিত করেছেন। হগার্থ তাঁর Analysis of Beauty (1753) গ্রন্থে সর্পিল বক্ররেখা (Serpentina) বা Line of Grace-এর কথা বলেছেন যা পিরামিড (Pyramid)-এর অন্তরে অবস্থিত হয়ে যে কোনো চিত্ররূপের সৌন্দর্যসৃষ্টি করে। এখানে সর্পিল রেখাটি জীবনের বিচিত্র গতি ও রূপের পরিচায়ক এবং পিরামিডটি এই বৈচিত্র্যকে বেঁধেছে একটি কাঠামোর বন্ধনে (চিত্র ১০)। অজন্তার কাহিনিচিত্র বা এককচিত্রগুলিতে ভগবান বুদ্ধের অবস্থান চিত্রের ভরকেন্দ্ররূপে তাঁকে ঘিরে ঘটে চলা ঘটনার আবর্তকে সংহতি দিয়েছে আর এই ধরনের চিত্রপরিকল্পনা সৌন্দর্যসৃষ্টির মূল তত্ত্বকেই যুগে যুগান্তরে সাধিত করেছে।

এইসব গুহাচিত্রে ভগবান বুদ্ধের জন্মান্তর ও জীবনকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই ষড়ঙ্গের যথাযথ প্রয়োগ করেছিলেন শিল্পীরা। অজন্তার প্রথম গুহায় আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে অঙ্কিত 'বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি' চিত্রে ষড়ঙ্গের বহু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 'বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি'কে 'অবলোকিতেশ্বর' বলেও উল্লেখ করা হয়। বুদ্ধের আংশিক অবতার অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, বিশ্বের সমস্ত জীব মুক্তি লাভ না করলে তিনি ব্যক্তিগত নির্বাণলাভ করবেন না। এই চিত্রে বোধিসত্ত্বকে কমনীয় যৌবনের প্রতিমূর্তিস্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। মাথার দামী রত্নখচিত মুকুটে, চোখের অর্ধনিমিলিত কাব্যিক দৃষ্টিতে, ডানহাতে লীলায়িত ভঙ্গীতে ধরা ব্রহ্মকমলে তাঁর সমগ্র রূপটিতেই গুপ্তযুগের শেষার্ধের বিলাসবহুল নাগরিক জীবনের প্রচ্ছন্ন ছায়া এবং গুহাশিল্পের পৃষ্ঠপোষক তৎকালীন দাক্ষিণাত্যের রূপবান রাজপুরুষদের আদল পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে পদ্মপাণির এই চিত্রের মধ্যে দিয়ে পার্থিব সুখ ও উপকরণের বাহুল্যই প্রকাশ পেয়েছে, যা একই গুহায় চিত্রিত 'বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি'র অলংকার ও মুকুটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে 'বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি'র আকৃতিতে ষড়ঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'সাদৃশ্যং'-এর প্রভূত প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর সিংহকটি, গজস্কন্ধ, পদ্মহস্ত, ধনুকের মতো ভ্রূযুগল, হাতির শুঁড়ের মতো বাহু এবং

পদ্মপলাশলোচন প্রভৃতির বর্ণনা ও চিত্রণ মহামানবের আদর্শ রূপসৃষ্টির লক্ষ্যেই করা হয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ সান্যালের বক্তব্য হল, "অজন্তা-চিত্রে শিল্পী এ-ভাবে প্রায় প্রতিটি চিত্রে একটা কোমলতা বা পেলবতার ভাব এনেছেন, যে সাবলীলতা ক্রমশ ভারতীয় চিত্র-শিল্পের সঙ্গে এমনভাবে অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেছে যে, ভারতীয় দর্শকের চোখে তা অপ্রাকৃত বা অবাস্তব বলে আদৌ মনে হয় না— স্বাভাবিক সৌন্দর্যের দ্যোতক রূপেই অনুভূত হয়" (সান্যাল ১৮৮)। এইভাবে অজন্তাচিত্রে মধুররস ও বীররসের দ্বন্দ্ব বুদ্ধচরিত্রকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে মানবিকতার আকররূপে প্রতিষ্ঠা করেছে।

বৈচিত্র্য এবং ঐক্য, চঞ্চলতা ও স্থৈর্য, মুক্তি ও শৃঙ্খলা এই বিপরীত ভাবগুলির টানাপড়েনে অজন্তার চিত্রাবলী পেয়েছে তার নাটকীয় চরিত্র। এ প্রসঙ্গে অশোক মিত্র একটি মূল্যবান উক্তি করেন—

সবার উপরে আছে জীবনের সম্বন্ধে একান্ত আগ্রহ, অসীম বিস্ময়, যার ফলে সংসারত্যাগী ভিক্ষু, বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি জপ করতে করতেও, নির্জন, ভয়াল গুহায় সারা বিশ্বের সৃষ্টি, তার রূপ, রস, গন্ধ, সৌন্দর্য, বিস্ময়, তীব্রতা, উত্তেজনা, আবেগ ভিড় করে ঢুকিয়েছেন; ধ্যান ভাঙ্গানোর জন্যে কি ধ্যান পরীক্ষার জন্যে জানি না। (মিত্র ৬১)

শিল্পীর সৌন্দর্যমুগ্ধতা এখানে সাধকের কৃচ্ছ্রসাধনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্বে লিপ্ত। অজন্তার প্রথম গুহার 'মহাজনক জাতকে'র চিত্রণে রানী সীবলীর দেহসৌন্দর্যে, ওই একই গুহায় কৃষ্ণা রাজকুমারীর লাবণ্যে, 'বুদ্ধের জন্ম' চিত্রে (প্রথম গুহায়) মায়াদেবীর মাধুর্যের মধ্যে, ষড়ঙ্গের 'সাদৃশ্যং'-এর অসংখ্য এবং অকৃপণ ব্যবহার দেখা যায়। এই নারীরা জন্মজন্মান্তরে বোধিসত্ত্বের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছেন, তাঁরা কখনও মায়াদেবী, মা গৌতমী, মা যশোধরা অথবা ভ্রাতৃবধূ জনপদকল্যাণী। অজন্তাচিত্রে অমর হ'য়ে থাকা এইসব নগ্ন এবং অর্ধনগ্ন নারীদের দেহসম্পদের বাহুল্যপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুল্ক রাজ আনন্দ অজন্তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিকেই ইঙ্গিত করেন—

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতকে আঁকা প্রথম ও দ্বিতীয় গুহার চিত্রাবলীর বৈশিষ্ট্যই হল বর্ণ, অলংকরণ ও আবেগের আতিশয্য।... চুল বাঁধার ধরণ আর অলংকারের চিত্রণে বেশী নজর দেওয়া হতে থাকে। নারীকে মোহিনীর ভঙ্গীতে উপস্থাপিত করা হয় আর তার সৌন্দর্যই ছবির বিষয়বস্তুর চেয়ে প্রাধান্য পেতে থাকে। চরিত্রগুলির দলবদ্ধতায় কৃত্রিমতা আসতে থাকে। নারীমূর্তির দীর্ঘ স্বপ্নালু চোখগুলি হতে থাকে অতিরঞ্জিত। ... এইভাবে অবক্ষয়ের সূচনা হয়। (আনন্দ ৪২)

অজন্তা সংস্কৃতির এই ঐতিহাসিক উত্থানপতনের কথা জানা সত্ত্বেও সাধারণভাবে এ কথাই বলা যায় যে, শ্রমণদের ব্রহ্মচর্যের কঠোর জীবনের সঙ্গে তাঁদের সৃষ্টির এই ভাববৈপরীত্য আপাতভাবে দর্শককে অবাক করলেও, ভেবে নিতে অসুবিধে হয় না যে, একদিকে যেমন সৌন্দর্যসৃষ্টি ছিল তাঁদের সাধনার অঙ্গ, অপরদিকে

দেহজাত রূপের এই চিত্রণের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষাদানের একটি প্রয়াসও রয়েছে, যা দর্শককে অষ্টাঙ্গিক মার্গের পথে নানা প্রলোভন পরিহার করে চলার নির্দেশ দেয়। সুতরাং, শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদেহের কমনীয় লাবণ্যকে নিপুণভাবে আঁকার মধ্যে শিল্পীর মনের রসগ্রাহিতার পরিচয়ও যেমন পাওয়া যায়, তেমনই নারীদেহের রূপকে 'মার'-এর প্রতীক হিসেবেও তুলে ধরার চেষ্টাও রয়েছে। এই দুই-এর দ্বন্দ্বে চরিত্রগুলি আরও ছন্দময় হয়ে ওঠে, যে ছন্দ প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিতেই বর্তমান আর সৃষ্টির অংশরূপে মানবদেহও তার অঙ্গ।

অজন্তার ছবিগুলি আখ্যানধর্মী চিত্র বা narrative painting, যেখানে জাতকের গল্পগুলি চিত্রভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়া বোঝাতে লতাপাতার নকশা, অথবা সৌধের থামের ব্যবহার দেখা যায়। একই চিত্রভূমিতে বিভিন্ন দলে চরিত্রগুলি ভাগ হয়ে গিয়ে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সমবেতভাবে এই কাহিনীচিত্রগুলিকে মহামানব বুদ্ধের জীবন-মহাকাব্যের উপস্থাপনা বলে ভেবে নেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, মহাকাব্যের অন্তর্গত বিচিত্র উপাখ্যানের মতোই অজন্তার গুহায় গুহায় আঁকা রয়েছে বিভিন্ন গল্প, যাদের কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে রূপান্তরে বোধিসত্ব ও তাঁকে ঘিরে নানা চরিত্র। গুহার পর গুহায় জীবনের এই বহুল রূপ কিন্তু একটিমাত্র ধ্রুবসত্যের সূত্রে গাঁথা— বুদ্ধের জীবন ও সাধনা, যা নিবৃত্তি, করুণা এবং ক্ষেমের শিক্ষাদান করে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে চরিত্রদের সাজসজ্জার প্রাচুর্য ও ভাবের বৈচিত্র্য মানবজীবনের বিভিন্ন আসক্তি ও প্রলোভনকেই বোঝায়, যাকে বুদ্ধদেব 'তন্হা' বলে অভিহিত করেছেন এবং এই 'তন্হা'কে জয় করার পথগুলি তাঁর জীবন দিয়েই বুঝিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষিতে অজন্তার শিল্পকলা জীবনের প্রলোভন এবং তা জয় করার পথগুলিকে উপস্থাপিত করে, বুদ্ধদেব যাকে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলেছেন। কিন্তু শিল্পের দৃষ্টিতে অজন্তা মানবজীবনের বিচিত্র ও ঘটনাবহুল পর্যায়গুলিকেই তুলে ধরেছে যার মধ্যে বুদ্ধও একজন মানুষ, যদিও তিনি মহামানব। বুদ্ধের মহামানব রূপটি অজন্তার ছবিতে প্রেক্ষাপট ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বোঝান হয়েছে। অজন্তাচিত্রে প্রেক্ষাপটকে ইউরোপীয় বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় নি, বরং প্রেক্ষাপটের প্রয়োগে এক দার্শনিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম গুহায় 'বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি'র চিত্রে বোধিসত্ত্বের অবয়বটি কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে আঁকা হয়েছে, তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হয়ে চলেছে দৈনন্দিন জীবনের কর্মচঞ্চলতা— মানুষ, পশুপাখি আর প্রকৃতি। এদের আকারে বোধিসত্ত্বের চেয়ে অনেক ছোট করে এঁকে একদিকে যেমন জগতের সামগ্রিকতাকে বোঝানো হয়েছে অপরদিকে বোধিসত্ত্বের মহামানব রূপটির ব্যঞ্জনা আনার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁকে ঘিরে ঘটে চলা কর্মের আবর্তনকে তিনি প্রত্যক্ষ করছেন বলেই তিনি 'অবলোকিতেশ্বর' আর এইভাবেই অজন্তার ছবিতে জীবনের বন্ধন ও মুক্তির সহাবস্থানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ব্যঞ্জনার সার্থক প্রকাশের ক্ষেত্রে অজন্তার ষোড়শ গুহার শ্রেষ্ঠ ছবি 'মরণাহতা রাজকন্যা' (চিত্র ১), যেখানে আঙ্গিকের কুশলী প্রয়োগে মানবজীবনের একটি

নাটকীয় মুহূর্ত ফুটে ওঠে। গুপ্তযুগে আঁকা এই চিত্রটি বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে জড়িত একটি ঘটনাকে তুলে ধরেছে। বুদ্ধ তাঁর ভাই নন্দকে তার বিবাহের পূর্বমুহূর্তে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছিলেন। নন্দের ভাবী স্ত্রী জনপদকল্যাণীর কাছে সেই নিষ্ঠুর সংবাদ যখন এসে পৌঁছলো, তখন তিনি শোকে আচ্ছন্ন হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। চিত্রটিতে অনিবার্য মৃত্যুর ছায়াকে ঘনিয়ে আসতে দেখা যায়। সমগ্র অজন্তা চিত্রাবলীর মধ্যে এটি একটি চরম উৎকর্ষের মুহূর্ত, যেখানে সর্বকালীন পার্থিব মৃত্যুশোককে চিত্রে ধরে রাখা হয়েছে। ষড়ঙ্গের অন্যতম প্রধান অঙ্গ 'ভাব'ই ছবিটিকে দিয়েছে বিশিষ্ট এক কারুণ্য। এই ছবিটি প্রসঙ্গে সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল তাঁর অজন্তার মূল্যায়নে শিল্পসমালোচক গ্রিফিথের উক্তির উল্লেখ করে এই কথারই সমর্থন করে বলেন, "ফ্লোরেন্সের শিল্পীরা হয়তো আরও ভাল রেখা টানতেন, ভেনিসের শিল্পীরা হয়তো রঙ লাগাতেন আরও সুন্দর করে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই এর চেয়ে গভীর ভাবের ব্যঞ্জনা চিত্রে তুলে ধরতে পারতেন না" (সান্যাল ১০৮)। রাজকন্যার মাথাটি সামান্য স্থানচ্যুত করে, বামহাতটি অবশভাবে এলিয়ে দিয়ে শিল্পী চিত্রে এনেছেন মৃত্যুর পূর্ববর্তী ভঙ্গিমাটি। পরিচর্যারতা তিন সখীর উৎকণ্ঠিতভাব, নন্দের পরিত্যক্ত রাজমুকুট হাতে দুই পরিচারক, পিছনের অলিন্দে বৈদ্য ও তাঁর সহকারিণী, ভবনের ছাদে ময়ূরের এলিয়ে পড়া পেখম আর কলাপাতার কোমল সবুজ রঙটি বিষাদের ভাবকে আরও গভীর করে। চিত্রে মানুষগুলির দেহের গাঢ় বাদামী-লালের বিপরীতে ঘন কালো চুলের রাশি মুখগুলিকে নিভন্ত অঙ্গারের আভা মাখিয়েছে। বৌদ্ধধর্মের অন্যতম সত্য 'করুনা'ই যেন এই চিত্রের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে, ভাগ্যের পরিহাসে যে ধর্মের আহ্বান জনপদকল্যাণীর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। জীবনের এই প্রেমজাত মোহের দিকটিকে জয় করার কথাই বুদ্ধ বারবার বলেছেন। সেক্ষেত্রে 'মরণাহতা রাজকন্যার' জীবনটি ধর্মের শিক্ষাকেই তুলে ধরে, যেখানে উপসম্পদার মহৎ পন্থার কাছে বিচ্ছেদজাত বেদনার রূপটি গৌণ। অপরদিকে শিল্পীর সংবেদনশীল মন জনপদকল্যাণীর জীবনটিকে এক বিয়োগান্তক নাটকের চরিত্র দেয়। এই অংশে এসে যেন আখ্যানধর্মী চিত্রের সমস্ত গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। অজন্তাচিত্রে বুদ্ধ ও তাঁর চারপাশের মানুষকে নিয়ে যে জীবননাট্য আবর্তিত, তারই চরমমুহূর্তটি এই খণ্ডচিত্রে বিবৃত। সেক্ষেত্রে 'মরণাহতা রাজকন্যা' ভাবপ্রকাশের এক সফল নিদর্শন। চিত্রের নৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিল্পীর ভাবগত উদ্দেশ্যের এক প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব এখানে লক্ষ্যণীয়।

এইভাবে ছবির পর ছবিতে দেখা যায় যে অজন্তায় বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় ধর্মের নৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে চিত্রাঙ্কনের ভাবগত উদ্দেশ্যের যে আপাত দ্বন্দ্বটি রয়েছে, তার সঙ্গেই পরিপূরক হিসেবে চলতে থাকে চিত্রের মধ্যেকার সরল ও তরঙ্গায়িত রেখার সমন্বয়ে উৎপন্ন আঙ্গিকগত দ্বন্দ্বটি। মুল্ক রাজ আনন্দ লক্ষ্য করেছেন, যে অজন্তাচিত্রে বক্ররেখার ডৌল (curve) লাবণ্যময় নমনীয়তা আর রেখার ছন্দের প্রতিই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিলো। চিত্রতলের উপর তরঙ্গায়িত রেখার

সাবলীল আর অনায়াস যাতায়াত একটি স্থিতিস্থাপক ভাবের সূচনা করে যা গতি ও কাব্যময়তার পরিচায়ক (আনন্দ ১৪)। অজন্তাচিত্রে সমগ্র জগৎকে আবিষ্কার করা হয়েছে এক অদম্য কৌতূহলের সঙ্গে, এবং তা প্রকাশ করা হয়েছে গভীর আবেদনময় বর্ণের সমন্বয়ে। সুখবাদী এই জগতের ক্ষয় অবধারিত, এ বুদ্ধেরই বাণী। তাই ধর্মের দৃষ্টিতে দেখলে এ জীবন অনিত্য, তবে শিল্পের দৃষ্টিতে দেখলে এই থাকা না থাকার দোলাচলতাই জীবনকে দিয়েছে তার গতিময় সত্তা। অবনীন্দ্রনাথ এই গতিকেই বলেছেন চিত্রের 'ছন্দ'। তাঁর মতে ছন্দ হল আনন্দদানকারী এক 'হ্লাদিনীশক্তি' এবং যে কোন দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্যসাধনেই এর সার্থকতা,

কাজেই দেখিতেছি, হ্লাদিনী যে শক্তি, তিনি— এক দিকে গতি বা মুক্তি, আর-এক দিকে স্থিতি বা বন্ধন— দুই পারের এই দুই আলিঙ্গনে সৎ যে, তাঁহাকে দোলা দিয়া বিক্রিয়া দিতেছেন। হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। সৎ যে বস্তুটি স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয় তিনি হ্লাদিনীশক্তির সচেতন আলিঙ্গন পাইয়া চিৎ এবং আনন্দরূপে নন্দিত হইয়া উঠিতেছেন বা ছন্দিত হইতেছেন। (অবনীন্দ্রনাথ ৫১)

শিল্পীর তুলির টানে পর্বতের স্থিতির ছন্দ আর তরঙ্গের গতির ছন্দ, এই দুই ধরনের ছন্দের সহাবস্থানেই চিত্র উৎকর্ষলাভ করে। ছন্দ যে ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করে সেটিই 'রস'। সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি হয় রসসৃষ্টি তবে অজন্তার অনামা সাধক-শিল্পীরা এ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করতে সার্থক হয়েছেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

আনন্দ, মুল্ক রাজ। অ্যালবাম অফ্ ইন্ডিয়ান পেইন্টিং। দিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৩। (প্রবন্ধে ব্যবহৃত গদ্যাংশ প্রবন্ধলেখক কর্তৃক অনূদিত)।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ। কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৪ (১৯৪৮)।

ভগিনী নিবেদিতা। অজন্তা। সম্পাদনা প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও সৌমেন পাল। অনুবাদ কমলিকা মিত্র। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩।

মিত্র, অশোক। ভারতের চিত্রকলা, প্রথম খণ্ড। ১৯৫৬। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫।

মিত্র, দেবলা। "অজন্তা"। ভারতকোষ। সম্পাদনা সুশীলকুমার দে ও অন্যান্য। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃষ্ঠা ২৮-৩০।

সান্যাল, নারায়ণ। অজন্তা অপরূপা। কলকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৭৬।

অজন্তা - চিত্রসূচী

চিত্র ১ (Figure - 01) - 'মরণাহতা রাজকন্যা', ষোড়শ গুহা

চিত্র ২ (Figure - 02) - 'কৃষ্ণা অপ্সরা', সপ্তদশ গুহা

চিত্র ৩ (Figure - 03) - 'মেঘলোকে ইন্দ্র', সপ্তদশ গুহা